দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 APR 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্কট উত্তরণ কোন পথে?

ডঃ আবদুল আউয়াল খান

গত কয়েক বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশবাসীর জন্য একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে মূলত: একটি কারণে, আর তা হচ্ছে উপাচার্যের ব্যর্থতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন যেহেতু উপাচার্যই স্বয়ং তাই তাঁর পক্ষে প্রশাসনিক কোন ব্যর্থতার গ্লানিও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই গ্লানিবোধ যেকোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন উপাচার্যের পক্ষেই দু:সহ, বিবেকের কষাঘাতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয় কোন মহল থেকে দাবী উঠার আগেই। এদিক থেকে বিচার করলে অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর পদত্যাগে বিলম্বের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও এর উপাচার্যের পদটির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

অধ্যাপক আলী উপাচার্য নিযুক্ত হবার শুরুতেই তাঁর কোটারী স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রগতিশীল অংশ থেকে। ক্ষমতার খুঁটি হিসেবে ভর করেন জামাত-শিবির পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অশুভ শক্তির ওপর। শিক্ষক নামধারী কিছুসংখ্যক চক্রান্তকারী অবতীর্ণ হয় তাঁর পদলেহনের কাজে। ছাত্রদের সাথে ক্লাস নেয়ার পরিবর্তে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁরা উপাচার্যের খেদমতে অবতীর্ণ হয়। এরা কোনরূপ প্রস্তুতি ব্যতিরেকে মাঝে মাঝে ক্লাসে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বলত--প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত আছি তাই তোমাদেরকে পড়াতে পারছিনা। একটু খোঁজ নিলেই এই মর্মে বহু তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। এসব শিক্ষকই বিপথগামী কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল ছাত্রকে ব্যবহার করতে থাকে নিজেদের স্বার্থে। কখনো কখনো এসব ছাত্রদের লেলিয়ে দেয় নির্দোষ, জ্ঞানপিপাসু ও আপোষহীন শিক্ষকদের কারো কারো বিরুদ্ধে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান সাহেবের বিরুদ্ধে এরূপ আক্রমণের ফলাফল অবশ্য বুমেরাং হয়ে আসে তাদের ওপরই।

বস্তুত:পক্ষে শিক্ষার পরিবেশ রচনায় ও সেশন জট দূরীকরণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে ঐতিহ্য তৈরী করে আসছিল তা সমগ্র জাতির জন্য ছিল অত্যন্ত আশাপ্রদ। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছিল যা অনুসরণীয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই সর্বপ্রথমে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন পরীক্ষার্থীদের নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে। শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন উপাচার্য আবুল ফজল সাহেব দিয়েছিলেন এতে নেতৃত্ব। কিন্তু অধ্যাপক আলী সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে চালাতে চাইলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে। চক্রান্তের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলেন তিনি---বিনষ্ট করলেন শিক্ষার পরিবেশ। ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটির ইমেজ দ্রুত ম্লান হতে থাকে দেশে ও বিদেশে। বহু ছাত্র হতাহত হয় প্রশাসন কর্তৃক মাসলম্যানদের প্রশ্রয়দানের কারণে। নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের দিন কাটতে থাকে দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে। প্রতিবাদের ঝড় উঠে সর্বত্র। শিক্ষক সমিতি বাধ্য হয় দীর্ঘ কর্মবিরতি পালনে এবং উপাচার্য কর্তৃক বিভিন্ন দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে। প্রসংগত:, গত মাত্র এক বছরে শিক্ষকদেরকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে যতগুলো মোকদ্দমা করতে হয়েছে তা এর পূর্বে ১৫ বছরেও করতে হয়নি এবং আদালতের রায় প্রায় সবক্ষেত্রেই উপাচার্যের বিরুদ্ধে গিয়েছে।

সংগত কারণেই ছাত্র-শিক্ষক-রাজনৈতিক সংগঠন ও জোট দাবী তুলে উপাচার্য মুহম্মদ আলীর অপসারণের। অবশেষে বাধ্য হয়েই তাঁকে চলে যেতে হলো উপাচার্যের পদ ছেড়ে। অধ্যাপক শামসুল হক বা অধ্যাপক রফিকের মত বিবেকের তাড়নায় বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ইমেজ ক্ষুণ্ন না করে যথাসময়ে যে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা মনে করার কোন কারণ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট বিপর্যস্ত করেই তিনি পদত্যাগ করেছেন।

যেভাবেই দেখা হোক না কেন, মুহম্মদ আলী সাহেবের বিদায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল সংগ্রামেরই বিজয় রচিত হয়েছে। বস্তুত: এ সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হয়েছিল কয়েক মাস পূর্বে অধ্যাপক আলী ইমদাদ খানের প্রো-ভি, সি হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান চ্যান্সেলার কর্তৃক প্রো-ভি, সি, নিয়োজিত হবার পর উপাচার্য আলীর একটা সুযোগ হয়েছিল প্রশাসনিক কাজে তাঁর সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করা। বলাবাহুল্য এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি বলেই অধ্যাপক আলী তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করেছেন।

অদ্ভুত এক আচরণের নজির স্থাপন করে গেলেন অধ্যাপক মুহম্মদ আলী। ছাত্র ভর্তি ও হলে সিট বরাদ্দ, সিনেট-সিন্ডিকেট সহ বিভিন্ন ফোরামে নির্বাচন এবং প্রক্টর-প্রভোষ্ট ইত্যাদি পদে নিয়োগের কাজে সীমাহীন অনিয়ম ও দুরাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষতি করে গেছেন তা অপূরণীয় ও ক্ষমার অযোগ্য। একজন উদারপন্থী লোক হয়েও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মান্ধদেরকে যেভাবে তিনি প্রশ্রয় দিয়ে গেলেন তাতে হতবাক হয়েছে জাতির বিবেক। ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘুরাতে গিয়ে তিনি নিজেই পিষ্ট হলেন তার নীচে। নিয়তি বড়ই নির্মম।

এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে, প্রথম থেকেই উপাচার্য মুহম্মদ আলী যদি ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে প্রগতিশীল অংশের সাথে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতেন তাহলে কি পরিস্থিতি ভিন্নরূপ হতে পারত না? নিশ্চয়ই পারত। তবে অধ্যাপক আলীর ন্যায় একদেশদর্শী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিচক্ষণতা প্রদর্শন ছিল প্রায় অসম্ভব। প্রতিপক্ষের সহায়তা দূরে থাকুক তাঁদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পূর্বসুরির ব্যর্থতার পটভূমিতে নব নিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দিন যদি তাঁর পূর্বসুরির ব্যর্থতার কারণগুলো চিহ্নিত করে সংকট উত্তরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেন তাহলে পরিস্থিতির উন্নতি না হবার কারণ নেই। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রচলিত প্রথা অনুসরণ না করে প্রো-ভি, সি,কে পাশ কাটিয়ে অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দিনকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টের আইনগত ফাঁকের কারণেই চ্যান্সেলরের পক্ষে এধরনের নিযুক্তি প্রদান সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে এ্যাক্টের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের মাধ্যমে এ ধরনের বিতর্কের অবসান ঘটানো যেতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নবনিযুক্ত উপাচার্য যদি তাঁর নিযুক্তির পটভূমি সম্পর্কে সচেতন থেকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষক সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে সকলের সাথে মত বিনিময় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনে একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হন, তবে অবশ্যই তা এই বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। এভাবে অগ্রসর হতে পারলেই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য জনসমক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও এর উপাচার্যের পদটির ভাবমূর্তি পুন: প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে মনে করি। এতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে অভিভাবক মহল ও জনমনে এর শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে যে সংশয় ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে তা আপাতত: নিরসন হবে বলে মনে হয়। তবে প্রয়োজনে কালবিলম্ব না করে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকেও এ গিয়ে আসতে হবে যাতে জামাত শিবির চক্র পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে। এ ব্যাপারে প্রগতিশীল মহলে মান-অভিমান বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আত্মঘাতী হতে বাধ্য। দেশবাসীও তা চায় না।

(লেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক)